একুশ

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ২০১৮

স্মরণিকা

ঢাকা কমার্স কলেজ
DHAKA COMMERCE COLLEGE
(স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত)
ঢাকা কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৯০০৪৯৪২, ৯০০৭৯৪৫, ৯০২৩৩৩৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯০৩৭৭২২
www.dcc.edu.bd dhaka commerce college

একুশ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি

পৃষ্ঠপোষক

এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মো. আবু সালেহ
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
সদস্য, গভর্নিং বডি

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর মো. শামছুল হুদা এফসিএ
সদস্য, গভর্নিং বডি

আহমেদ হোসেন
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মো. এনায়েত হোসেন মিয়া
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর ডা. এম এ রশীদ
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
সদস্য, গভর্নিং বডি

শামীমা সুলতানা
সদস্য, গভর্নিং বডি

এ কে এম মোরশেদ
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মো. জুলফিকার রহমান
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মো. আবু সাইদ, অধ্যক্ষ
প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)
প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

সম্পাদনা পরিষদের আহ্বায়ক

এস এম আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও
আহ্বায়ক, সাংস্কৃতিক কমিটি

সম্পাদক

মীর মো. জহিরুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য

পার্থ বাড়ৈ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সম্পাদনা সহকারী

মো. মিজানুর রহমান, বিবিএ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, রোল: এফ ১২১৫
নাবির হোসেন, বিবিএ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, রোল: এ ১২৯৭
মো. তানভীর ইমতিয়াজ সিয়াম, বিবিএ (সম্মান) ২য় বর্ষ, রোল: এম ১২৫৪

প্রকাশনায় : ঢাকা কমার্স কলেজ

একুশের গান

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু ঝরা এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।।

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবী
দিন বদলের ক্রান্তিলগ্নে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।

সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে;
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকনন্দা যেন,
এমন সময় ঝড় এলো এক ঝড় এলো খ্যাপা বুনো।।

সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোঁড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবীকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই সারা বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।।

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভায়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাটে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।।

রচয়িতা : আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৫২)
সুরকার : আলতাফ মাহমুদ (১৯৫৪)

আমরা তোমাদের ভুলবোনা

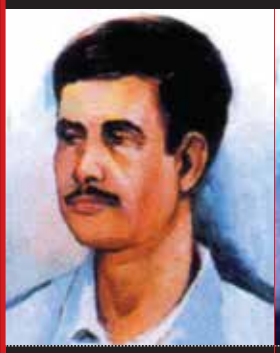

ভাষা শহিদ আবদুস সালাম
১৯২৫-১৯৫২

ভাষা শহিদ আবুল বরকত
১৯২৭-১৯৫২

ভাষা শহিদ রফিক উদ্দীন আহমদ
১৯২৬-১৯৫২

ভাষা শহিদ আবদুল জব্বার
১৯১৯-১৯৫২

ভাষা শহিদ শফিউর রহমান
১৯১৮-১৯৫২

৫২'র ভাষা আন্দোলনে বীর শহিদদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ এর কর্মসূচি

প্রভাত ফেরি
'মাতৃভাষা ও আমাদের শিক্ষার মাধ্যম' শীর্ষক আলোচনা সভা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
একুশে সম্মাননা প্রদান
ভাষা চিত্র প্রদর্শনী, বইমেলা, স্মরণিকা ও দেয়ালিকা প্রকাশ
বিতর্ক, ভাষা, রচনা, আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতা

প্রধান অতিথি
ড. জসীম উদ্দিন আহমেদ
ভাষাসৈনিক, একুশে পদকপ্রাপ্ত
পরমাণু বিজ্ঞানী, কবি, লেখক ও গবেষক

বিশেষ অতিথি
এ এফ এম সরওয়ার কামাল
চেয়ারম্যান, বিইউবিটি ট্রাস্ট
উদ্যোক্তা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা কমার্স কলেজ
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মূল প্রবন্ধকার
এম আর মাহবুব
ভাষা-গবেষক ও লেখক
নির্বাহী পরিচালক, ভাষা-আন্দোলন গবেষণা কেন্দ্র ও জাদুঘর

মুখ্য আলোচক
মো. নাছির উদ্দীন
লেখক ও সম্পাদক, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (বাংলা), এনসিটিবি

আলোচক
প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন), ঢাকা কমার্স কলেজ
প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল
উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক), ঢাকা কমার্স কলেজ

স্বাগত বক্তা
এস এম আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক ও আহবায়ক
সাংস্কৃতিক কমিটি, ঢাকা কমার্স কলেজ

সভাপতি
প্রফেসর মো. আবু সাইদ
অধ্যক্ষ, ঢাকা কমার্স কলেজ

তারিখ : ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮
সময় : সকাল ৭:৩০-১১:০০ টা

ভাষা শহিদ পরিচিতি

আবুল বরকত

শহীদ হয়েছেন ২১-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ

পরিচয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এমএ ক্লাসের ছাত্র।
পিতার নাম : মৌলভী শামসুজ্জোহা ওরফে ভুলু মিয়া (১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)
মাতার নাম : হাজী হাসিনা বিবি (১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)
তিন বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে আবুল বরকত ছিলেন পিতামাতার চতুর্থ সন্তান।
জন্ম : ১৬ জুন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ
জন্মস্থান : গ্রাম-বাবলা ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, রাষ্ট্র : ভারত।
ঢাকার ঠিকানা : বিষ্ণু প্রিয়া ভবন, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

আবদুল জব্বার

শহীদ হয়েছেন ২১-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ

পরিচয় : সাধারণ গ্রামীণ কর্মজীবী মানুষ ছিলেন
পিতার নাম : মরহুম হাছেন আলী (১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)
মাতার নাম : সফাতুন্নেসা (১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)
পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে আবদুল জব্বার ছিলেন দ্বিতীয়।
আবদুল জব্বারের স্ত্রীর নাম আমেনা খাতুন ও তার একমাত্র ছেলের নাম নূরল ইসলাম বাদল
(১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৫ মাস)
জন্ম : ১৩ আগস্ট ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ
জন্মস্থান : পাঁচুয়া, ইউনিয়ন : রাওনা, উপজেলা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ।

রফিক উদ্দীন আহমদ

শহীদ হয়েছে ২১-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ

পরিচয় : মানিকগঞ্জ জেলার দেবেন্দ্রনাথ কলেজের বাণিজ্য বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।
পিতার নাম : মরহুম আবদুল লতিফ (১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)
মাতার নাম : রাফিজা খানম (মৃত্যু ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে)
জন্ম : ৩০ অক্টোবর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
জন্মস্থান : গ্রাম : পারিল, উপজেলা : সিঙ্গাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ।
রফিক উদ্দীন আহমদের ছোট ভাইয়ের নাম খোরশেদ আলম, তিনি এখনো জীবিত।
শহীদ রফিক উদ্দীন আহমদ ২০০০ সালে মরণোত্তর একুশে পদক পান।

আবদুস সালাম

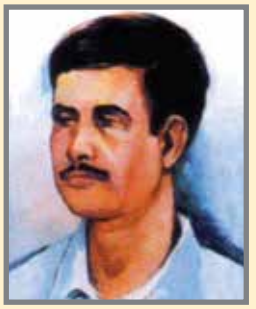

গুলিবিদ্ধ হন ২১-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে
হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে ৭-৪-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বেলা ১১টায় মৃত্যুবরণ করেন।
পরিচয় : ডাইরেক্টর অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফিসে রেকর্ড কিপার পদে চাকরি করতেন।
পিতার নাম : মরহুম মো. ফাজিল মিয়া (১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)
মাতার নাম : দৌলতন নেছা (১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)
তিন বোন ও চার ভাইয়ের মধ্যে আবদুস সালাম ছিলেন সবার বড়।
তার সবচেয়ে ছোট ভাই এখনো জীবিত।
জন্ম : ২৭ নভেম্বর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
জন্মস্থান : গ্রাম : লক্ষণপুর, ইউনিয়ন : মাতৃভূঞা, থানা : দাগনভূঞা, জেলা : ফেনী।

শফিউর রহমান

শহীদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ

পরিচয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ক্লাসের প্রাইভেট ছাত্র ও ঢাকা হাইকোর্টের কর্মচারী। বংশাল রোডের মাথায় শহীদ হন (ঢাকা)।

পিতার নাম : মরহুম মাহবুবুর রহমান

মাতার নাম : মরহুমা কানেতাতুন্নেসা

শফিউর রহমানের স্ত্রীর নাম আকিলা খাতুন (বর্তমানে জীবিত বয়স আনুমানিক ৮৩ বছর)। শফিউরের ছেলের নাম শফিকুর রহমান ও মেয়ের নাম আসফিয়া খাতুন। বর্তমানে তারা সবাই উত্তরা মডেল টাউনের বাসিন্দা।

জন্ম : ২৪ জানুয়ারি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ, জন্মস্থান : গ্রাম : কোন্নাগর, জেলা : হুগলি, রাষ্ট্র : ভারত।

ঢাকার ঠিকানা : হেমেন্দ্রনাথ রোড, ঢাকা।

পদক : ১৯৯০ সালে শহীদ শফিউর রহমানকে মরণোত্তর একুশে পদক দেয়া হয়।

স্বীকৃতিবিহীন তিন ভাষা শহিদ

মো. অহিউল্লাহ

শহীদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকার নবাবপুর এলাকার বংশাল রোডের মাথায় সশস্ত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হন এবং তার লাশ পুলিশ অপহরণ করে।

পরিচয় : শিশু শ্রমিক

পিতার নাম : হাবিবুর রহমান

পিতার পেশা : রাজমিস্ত্রি

জন্ম : ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ (আনুমানিক)

জন্মস্থান : অজ্ঞাত

আবদুল আউয়াল

শহীদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ।

(বর্তমান ঢাকা রেল হাসপাতাল কর্মচারী সংলগ্ন এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর মোটর গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু)।

পরিচয় : রিকশাচালক

পিতার নাম : মো. আবদুল হাশেম

জন্ম : ১১ মার্চ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ (আনুমানিক)

জন্মস্থান : সম্ভবত গেন্ডারিয়া, ঢাকা।

সিরাজুদ্দিন

শহীদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ঢাকার নবাবপুরে 'নিশাত' সিনেমা হলের বিপরীত দিকে মিছিলে থাকা অবস্থায় টহলরত ইপিআর জওয়ানের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

ঠিকানা : বাসাবাড়ি লেন, তাঁতিবাজার, ঢাকা।

পরিচয় : সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

একুশের ঘটনা

একুশের প্রভাত ফেরিতে মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৫৪)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একুশের প্রভাত ফেরিতে ফরিদা বারী, জহরতআরাসহ ছাত্রীবৃন্দ (১৯৫৩)

ভাষা শহিদদের স্মরণে স্মৃতি স্তম্ভ (১৯৫২)

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণে আমতলায় ঐতিহাসিক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী এ দিন সকাল ৯টা থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এসে জড়ো হয়। তারা ১৪৪ ধারা জারির বিপক্ষে স্লোগান দিতে থাকে এবং পূর্ব বঙ্গ আইন পরিষদের সদস্যদের ভাষা সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মতামতকে বিবেচনা করার আহ্বান জানাতে থাকে। পুলিশ অস্ত্র হাতে সভাস্থলের চারদিক ঘিরে রাখে। বিভিন্ন অনুষদের ডীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঐসময় উপস্থিত ছিলেন। বেলা সোয়া এগারটার দিকে ছাত্ররা গেটে জড়ো হয়ে প্রতিবন্ধকতা ভেঙে রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছাত্রদের সতর্ক করে দেয়। কিছু ছাত্র ঐসময়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দিকে দৌঁড়ে চলে গেলেও বাদ বাকিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পুলিশ দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পুলিশের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। উপাচার্য তখন পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ বন্ধ করতে অনুরোধ জানান এবং ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু ছাত্ররা ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময় কয়েকজনকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার শুরু করলে সহিংসতা ছড়ায়ে পড়ে। অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করে তেজগাঁও নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। এ ঘটনায় ছাত্ররা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে পুনরায় তাদের বিক্ষোভ শুরু করে।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণ, ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রাক্কালে বেলা ২টার দিকে আইন পরিষদের সদস্যরা আইনসভায় যোগ দিতে এলে ছাত্ররা তাদের বাঁধা দেয়। কিন্তু পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে যখন কিছু ছাত্র সিদ্ধান্ত নেয় তারা আইনসভায় গিয়ে তাদের দাবি উত্থাপন করবে। ছাত্ররা ঐ উদ্দেশ্যে আইনসভার দিকে রওনা করলে বেলা ৩টার দিকে পুলিশ দৌঁড়ে এসে ছাত্রাবাসে গুলিবর্ষণ শুরু করে। পুলিশের গুলিবর্ষণে আব্দুল জব্বার এবং রফিক উদ্দিন আহমেদ ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এছাড়া আব্দুস সালাম, আবুল বরকতসহ আরও অনেকে সেসময় নিহত হন। ঐদিন অহিউল্লাহ নামের একজন ৮/৯ বছরেরে কিশোরও নিহত হয়।

ছাত্র হত্যার সংবাদ দ্রুত ছড়ায়ে পড়লে জনগণ ঘটনাস্থলে আসার উদ্যোগ নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত অফিস, দোকানপাট ও পরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রদের শুরু করা আন্দোলন সাথে সাথে জনমানুষের আন্দোলনে রূপ নেয়। রেডিও শিল্পীরা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে শিল্পী ধর্মঘট আহ্বান করে এবং রেডিও স্টেশন পূর্বে ধারণকৃত অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে থাকে।

ঐসময় গণপরিষদে অধিবেশন শুরুর প্রস্তুতি চলছিল। পুলিশের গুলির খবর জানতে পেরে মাওলানা তর্কবাগিশসহ বিরোধী দলীয় বেশ কয়েকজন অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ান। গণপরিষদে মনোরঞ্জন ধর, বসন্তকুমার দাস, শামসুদ্দিন আহমেদ এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সহ মোট ছয়জন সদস্য মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনকে হাসপাতালে আহত ছাত্রদের দেখতে যাবার জন্যে অনুরোধ করেন এবং শোক প্রদর্শনের লক্ষ্যে অধিবেশন স্থগিত করার কথা বলেন। কোষাগার বিভাগের মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ, শরফুদ্দিন আহমেদ, সামসুদ্দিন আহমেদ খন্দকার এবং মসলেউদ্দিন আহমেদ এই কার্যক্রমে সমর্থন দিয়েছিলেন। যদিও নুরুল আমিন অন্যান্য নেতাদের অনুরোধ রাখেননি এবং অধিবেশনে বাংলা ভাষার বিরোধিতা করে বক্তব্য দেন।

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার

ভাষা শহিদদের স্মরণে প্রথম শহিদ মিনারের অনুকরণে রাজশাহী কলেজে নির্মিত শহিদ মিনার (২০০৯)

বর্তমান কেন্দ্রিয় শহিদ মিনার

শহিদ মিনার

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিসৌধ। এটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্থলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে অবস্থিত।

প্রথম শহিদ মিনার নির্মাণ হয়েছিল অতিদ্রুত এবং নিতান্ত অপরিকল্পিতভাবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ শুরু করে রাত্রির মধ্যে তা সম্পন্ন করে। শহিদ মিনারের খবর কাগজে পাঠানো হয় ঐ দিনই। শহিদ বীরের স্মৃতিতে- এই শিরোনামে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ছাপা হয় শহিদ মিনারের খবর।

মিনারটি তৈরি হয় মেডিকেলের ছাত্র হোস্টেলের (ব্যারাক) বার নম্বর শেডের পূর্ব প্রান্তে। কোণাকুণিভাবে হোস্টেলের মধ্যবর্তী রাস্তার গা-ঘেঁষে। উদ্দেশ্য বাইরের রাস্তা থেকে যেন সহজেই চোখে পড়ে এবং যে কোনো শেড থেক বেরিয়ে এসে ভেতরের লম্বা টানা রাস্তাতে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে। শহিদ মিনারটি ছিল ১০ ফুট উচ্চ ও ৬ ফুট চওড়া। মিনার তৈরির তদারকিতে ছিলেন জিএস শরফুদ্দিন (ইঞ্জিনিয়ার শরফুদ্দিন নামে পরিচিত), ডিজাইন করেছিলেন বদরুল আলম। সাথে ছিলেন সাঈদ হায়দার। তাদের সহযোগিতা করেন দুইজন রাজমিস্ত্রী। মেডিকেল কলেজের সম্প্রসারণের জন্য জমিয়ে রাখা ইট, বালি এবং পুরান ঢাকার পিয়ারু সর্দারের গুদাম থেকে সিমেন্ট আনা হয়। ভোর হবার পর একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় মিনারটি। ঐ দিনই অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে, ২২ ফেব্রুয়ারির শহিদ শফিউরের পিতা অনানুষ্ঠানিকভাবে শহিদ মিনারের উদ্বোধন করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে দশটার দিকে শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। উদ্বোধনের দিন অর্থাৎ ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সেনাবাহিনী মেডিকেলের ছাত্র হোস্টেল ঘিরে ফেলে এবং প্রথম শহিদ মিনার ভেঙ্গে ফেলে। এরপর ঢাকা কলেজেও একটি শহিদ মিনার তৈরি করা হয়, এটিও একসময় সরকারের নির্দেশে ভেঙ্গে ফেলা হয়।

অবশেষে, বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেবার পরে ১৯৫৭ সালের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের কাজ শুরু হয়। এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির তত্ত্বাবধানে।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

১৯৫৬ সালে আবু হোসেন সরকারের মুখ্যমন্ত্রীত্বের আমলে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের বর্তমান স্থান নির্বাচন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। তৎকালীন পূর্ত সচিব (মন্ত্রী) জনাব আবদুস সালাম খান মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে 'শহিদ মিনারের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য চূড়ান্তভাবে একটি স্থান নির্বাচন করেন। ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে জনৈক মন্ত্রীর হাতে 'শহিদ মিনারের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা থাকলেও তাতে উপস্থিত জনতা প্রবল আপত্তি জানায় এবং ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহিদ রিক্সাচালক আওয়ালের ৬ বছরের মেয়ে বসির-ণকে দিয়ে এ স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

স্থাপত্য নকশা

শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং আওয়ামী লীগের উদ্যোগে যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়। এরফলেই শহিদ মিনারের নতুন স্থাপনা নির্মাণ করা সহজতর হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হামিদুর রহমান মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত শহিদ মিনারের স্থপতি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। তাঁরই রূপকল্পনা অনুসারে নভেম্বর, ১৯৫৭ সালে তিনি ও নভেরা আহমেদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সংশোধিত আকারে শহিদ মিনারের নির্মাণ কাজ কাজ শুরু হয়। এ নকশায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সম্মুখভাগের বিস্তৃত এলাকা এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৬৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহিদ ব্যক্তিত্ব আবুল বরকতের মাতা হাসিনা বেগম কর্তৃক নতুন শহিদ মিনারের উদ্বোধন করা হয়।

একুশের প্রথম কবিতা

কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

ওরা চল্লিশজন কিংবা আরো বেশি
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে-রমনার রৌদ্রদগ্ধ কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায়
ভাষার জন্য, মাতৃভাষার জন্য-বাংলার জন্য।
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
একটি দেশের মহান সংস্কৃতির মর্যাদার জন্য
আলাওলের ঐতিহ্য
কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের
সাহিত্য ও কবিতার জন্য
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
পলাশপুরের মকবুল আহমদের পুঁথির জন্য
রমেশ শীলের গাথার জন্য,
জসীমউদ্দীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাটের' জন্য।
যারা প্রাণ দিয়েছে
ভাটিয়ালি, বাউল, কীর্তন, গজল
নজরুলের "খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি।"
এ দুটি লাইনের জন্য
দেশের মাটির জন্য,
রমনার মাঠের সেই মাটিতে
কৃষ্ণচূড়ার অসংখ্য ঝরা পাপড়ির মতো
চল্লিশটি তাজা প্রাণ আর
অঙ্কুরিত বীজের খোসার মধ্যে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের অসংখ্য বুকের রক্ত।
রামেশ্বর, আবদুস সালামের কচি বুকের রক্ত
বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সেরা কোনো ছেলের বুকের রক্ত।
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের প্রতিটি রক্তকণা
রমনার সবুজ ঘাসের উপর
আগুনের মতো জ্বলছে, জ্বলছে আর জ্বলছে।
এক একটি হীরের টুকরোর মতো
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলে চলিশটি রত্ন
বেঁচে থাকলে যারা হতো
পাকিস্তানের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ
যাদের মধ্যে লিংকন, রকফেলার,
আরাগঁ, আইনস্টাইন আশ্রয় পেয়েছিল
যাদের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিল
শতাব্দীর সভ্যতার
সবচেয়ে প্রগতিশীল কয়েকটি মতবাদ,
সেই চলিশটি রত্ন যেখানে প্রাণ দিয়েছে
আমরা সেখানে কাঁদতে আসিনি।
যারা গুলি ভরতি রাইফেল নিয়ে এসেছিল ওখানে
যারা এসেছিল নির্দয়ভাবে হত্যা করার আদেশ নিয়ে
আমরা তাদের কাছে
ভাষার জন্য আবেদন জানাতেও আসিনি আজ।
আমরা এসেছি খুনি জালিমের ফাঁসির দাবি নিয়ে।
আমরা জানি ওদের হত্যা করা হয়েছে
নির্দয়ভাবে ওদের গুলি করা হয়েছে
ওদের কারো নাম তোমারই মতো ওসমান
কারো বাবা তোমারই বাবার মতো
হয়তো কেরানি, কিংবা পূর্ব বাংলার
নিভৃত কোনো গাঁয়ে কারো বাবা
মাটির বুক থেকে সোনা ফলায়
হয়তো কারো বাবা কোনো
সরকারি চাকুরে।
তোমারই আমারই মতো
যারা হয়তো আজকেও বেঁচে থাকতে
পারতো,
আমারই মতো তাদের কোনো একজনের
হয়তো বিয়ের দিনটি পর্যন্ত ধার্য হয়ে গিয়েছিল,
তোমারই মতো তাদের কোনো একজন হয়তো
মায়ের সদ্যপ্রাপ্ত চিঠিখানা এসে পড়বার আশায়
টেবিলে রেখে মিছিলে যোগ দিতে গিয়েছিল।
এমন এক একটি মূর্তিমান স্বপ্নকে বুকে চেপে
জালিমের গুলিতে যারা প্রাণ দিল
সেই সব মৃতদের নামে
আমি ফাঁসি দাবি করছি।
যারা আমার মাতৃভাষাকে নির্বাসন দিতে চেয়েছে তাদের জন্যে
আমি ফাঁসি দাবি করছি
যাদের আদেশে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের জন্যে
ফাঁসি দাবি করছি
যারা এই মৃতদেহের উপর দিয়ে
ক্ষমতার আসনে আরোহণ করেছে
সেই বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে।
আমি তাদের বিচার দেখতে চাই।
খোলা ময়দানে সেই নির্দিষ্ট জায়গাতে
শাস্তিপ্রাপ্তদের গুলিবিদ্ধ অবস্থায়
আমার দেশের মানুষ দেখতে চায়।
পাকিস্তানের প্রথম শহীদ
এই চল্লিশটি রত্ন,
দেশের চল্লিশ জন সেরা ছেলে
মা, বাবা, নতুন বৌ, আর ছেলে মেয়ে নিয়ে
এই পৃথিবীর কোলে এক একটি
সংসার গড়ে তোলা যাদের স্বপ্ন ছিল
যাদের স্বপ্ন ছিল আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে
আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার,
যাদের স্বপ্ন ছিল আণবিক শক্তিকে
কী ভাবে মানুষের কাজে লাগানো যায়
তার সাধনা করার,
যাদের স্বপ্ন ছিল রবীন্দ্রনাথের
'বাঁশিওয়ালার' চেয়েও সুন্দর
একটি কবিতা রচনা করার,
সেই সব শহীদ ভাইয়েরা আমার
যেখানে তোমরা প্রাণ দিয়েছ
সেখানে হাজার বছর পরেও
সেই মাটি থেকে তোমাদের রক্তাক্ত চিহ্ন
মুছে দিতে পারবে না সভ্যতার কোনো পদক্ষেপ।
যদিও অগণন অস্পষ্ট স্বর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করবে
তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঘণ্টা ধ্বনি
প্রতিদিন তোমাদের ঐতিহাসিক মৃত্যুক্ষণ
ঘোষণা করবে।
যদিও ঝঞ্ঝা-বৃষ্টিপাতে-বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভিত্তি পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে পারে
তবু তোমাদের শহীদ নামের ঔজ্জ্বল্য
কিছুতেই মুছে যাবে না।
খুনি জালিমের নিপীড়নকারী কঠিন হাত
কোনো দিনও চেপে দিতে পারবে না
তোমাদের সেই লক্ষদিনের আশাকে,
যেদিন আমরা লড়াই করে জিতে নেব
ন্যায়-নীতির দিন
হে আমার মৃত ভাইরা,
সেই দিন নিস্তব্ধতার মধ্য থেকে
তোমাদের কণ্ঠস্বর
স্বাধীনতার বলিষ্ঠ চিৎকারে
ভেসে আসবে
সেই দিন আমার দেশের জনতা
খুনি জালিমকে ফাঁসির কাষ্ঠে
ঝুলাবেই ঝুলাবে
তোমাদের আশা অগ্নিশিখার মতো জ্বলবে
প্রতিশোধ এবং বিজয়ের আনন্দে।

চট্টগ্রাম, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ রাতে রচিত

মাতৃভাষা ও আমাদের শিক্ষার মাধ্যম

এম আর মাহবুব

ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতিসত্তা বিনির্মানের প্রথম সোপান। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রাণ বিসর্জনের ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসের বিরল ঘটনা। বাহান্ন'র ভাষা আন্দোলনের ৬৬ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এরি মধ্যে ভাষা আন্দোলনের রক্তস্নাত পথ ধরে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'অমর একুশে' আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

প্রশ্ন হচ্ছে একুশের চেতনা ও একুশের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে? একুশের আন্দোলনের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল সর্বস্তরে বিশেষকরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার প্রচলন। এ কথা অনস্বীকার্য যে মাতৃভাষা ছাড়া কোন জাতি প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পারে না। বিশ্বের প্রতিটি দেশেই শিক্ষার সকল স্তরে মাতৃভাষার ব্যবহার অপরিহার্য। আমাদের দেশে একুশের চেতনা বাস্তবায়নে শিক্ষার সর্বস্তরে ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা কতটুকু চালু করতে পেরেছি তা বিবেচনাযোগ্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন একেবারে যে নেই তা নয়। বাংলা ভাষা একটি সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক ভাষা হবার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। বাংলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে অনেক বাঙ্গালি আজ দেশ-বিদেশে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

তবে এ কথাও সত্য একুশের ৬৬ বছর পরও সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন হয়নি। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা আজও উপেক্ষিত। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে দেশের সকল নাগরিকের জন্য একমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে মূলত তিন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চলে আসছে পাকিস্তান আমল থেকে। একটি মূলধারা যা বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা ব্যবস্থা, একটি মাদ্রাসা ধারা এবং আর একটি ইংরেজি মাধ্যম। বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা ব্যবস্থাই শিক্ষার মূলধারা। কিন্তু আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার মূলধারা উপেক্ষিত। এর একটি কারণ হলো ইংরেজি ভাষা সমাজে অভিজাত ভাষা হিসেবে চিহ্নিত। মহানগর ও জেলা শহরে ইংরেজি মাধ্যমের প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যাধিক্য এ ভাবনাটিকে আরো সুদৃঢ় করছে। বিত্তবান ও শহুরে শিশুরা ইংরেজিকেই প্রধান ভাষা বিবেচনা করছে। অনেকেই বলেছেন, শিশু বয়সে পরিপূর্ণ শিক্ষালাভ সম্ভব কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমে। এর অর্থ হলো ব্যক্তির সার্বিক উন্নয়নের জন্য ও মাতৃভাষার মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান অপরিহার্য। সমকালীন পন্ডিতরাও মনে করেন, মাতৃভাষাই শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সাধারণ মানুষের যথার্থ আবাসন।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে গুরুত্ব দেয়ার অর্থ ইংরেজিকে অবহেলা করা নয়। বর্তমানে বৈশ্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে মাতৃভাষাসহ একাধিক বিদেশি ভাষা জানা থাকলে পেশাগত জীবনে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। ইংরেজি ছাড়া ফরাসি, স্প্যানিশ, রাশিয়ান বা চীনা ভাষা জানা থাকলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চাকরি বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পরিধি বেড়ে যায়। তবে বিদেশি ভাষা শেখার আগে মাতৃভাষা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। মাতৃভাষার ওপর দখল স্থাপন করা গেলে বিদেশি ভাষা শেখা সহজ হয়ে যায়। যেকোন শিশুর কথা ফোটে তার মায়ের কাছে শোনা ভাষায় অর্থাৎ মাতৃভাষায়।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশ কটি ধারা রয়েছে। বাংলা, ইংরেজি মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি ভার্সন। প্রাইমারি পর্যায়ে বাংলা মাধ্যমে ইংরেজি সঠিকভাবে পড়ানো সম্ভব হয় না যোগ্য শিক্ষকের অভাবে। আবার ইংরেজি মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে অবহেলা করা হয়। বাংলাদেশে বাংলা ছাড়াও আদিবাসীদের অনেকের রয়েছে নিজস্ব মাতৃভাষা। তাদের চার-পাঁচটি ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা আছে। তাদের কথাও ভাবতে হবে। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়টি তাই সামগ্রিক-ভাবে দেখতে হবে।

খাজা আহ্ছানউল্লাহ বলেছেন, "মনে উৎসাহ যোগাতে হলে, নবশক্তির সঞ্চার করতে হলে মাতৃভাষা অপরিহার্য"। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ভাষায়, "আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি তারপর ইংরেজি শিখার পত্তন" । এটা বুঝতে হবে মাতৃভাষা শিশুকে সার্বিকভাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। ঘরে মা-বাবাসহ বড়রা যে ভাষায় কথা বলে, চারপাশে যে ভাষা শিশু শোনে, যে ভাষাটি সর্বত্র সর্বক্ষণ তার কানে বাজে সে ভাষাটি বাদ দিয়ে কোন শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। শুরুতে বিদেশি ভাষা ব্যবহার করা হলে শিশুর মনে হবে তার ওপর কোনো একটা কিছু আরোপ করা হচ্ছে। এ অবস্থায় শিশুটি এক ধরণের প্রতিকূলতার মধ্যেই বড় হবে। তার মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হবে।

মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় সেই ১৯৩৭ সালের দিকে। তখন বঙ্গদেশে School Education in Bengal -এর রিপোর্টেও শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক স্তরে বাংলা শিক্ষাদানের যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তাতে- Handwriting and Reading -এর ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যসূচি এমনভাবে সাজানো হয় যাতে শিক্ষার্থীরা গদ্যে ইতিহাস ও পৌরাণিক কাহিনী পড়ে দেশের মানুষের অনুসৃত ধর্ম, ব্যক্তিত্ব, জীবনকথা, নীতিবোধ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে এবং বাংলা কবিতার রসময় সৃষ্টিশীল ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যবই কীরূপ হবে সে সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়- 'An illustrated reader of 150 pages (including 30 pages of poetry) of which 50 pages will be devoted to historical tales.' প্রাথমিক স্তরের প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে 'Sentence অথবা 'Look and Say' শিক্ষাপদ্ধতি চালু করার কথা থাকলেও পরবর্তীতে বাক্যক্রমিক পদ্ধতি ও ভাষাভিত্তিক বাংলা শিক্ষাদানের চিন্তা তখনও এতে স্ফুরিত হতে দেখি না। তবে ১৮৫৪ সালে উড-এর ডেসপ্যাচে যখন থেকে এদেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় মাতৃভাষা শিক্ষাদানের স্বীকৃতি লাভ ঘটে এবং ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এর অধীনে প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদানের জন্য ১০০ নম্বর প্রবর্তিত হয়, তখন থেকে আনুষ্ঠানিক বাংলা শিক্ষায় এক ধরনের পাঠ্যসূচির যে কাঠামো চলে আসছিল

তার সর্বপ্রথম বিস্তৃত বিন্যস আমরা দেখতে পাই ১৯৭৫ সালে গঠিত ও ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে" (প্রফেসর শফিউল আলম)।

পৃথিবীর বহুদেশ মাতৃভাষা চর্চাকরে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলছে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে এর যথার্থতা খুজে পাওয়া যাবে। জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি, চীন সহ পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সব দেশেই শিক্ষার প্রধান বাহন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাষা হলো তাদের মাতৃভাষা। এই সব দেশের উন্নয়ন ও সাফল্যে মাতৃভাষা অন্তরায় নয় বরং সহায়ক। পৃথিবীর সকল দেশ মাতৃভাষার মাধ্যমে উন্নত হতে পারলে আমরা কেন পারব না। জীবন ও জিবীকার প্রয়োজনে একাধীক ভাষা শিখতে তো কোন বাধা নেই যারা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিযোগীতায় অবর্তী-র্ণ হবেন, যারা বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষায় ব্রত হবেন, গবেষণা করবেন তাদের জন্য অবশ্যই বিদেশী ভাষা জানা বাধ্যতামূলক। তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ইংরেজি সহ অন্যান্য ভাষা শিখে নেবেন। আমাদের শিক্ষাঙ্গনে সে রকম ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয়। হাতেগনা কয়েকজন লোকের আবশ্যকতার কারণে আপামর সকল শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার মত নীতিহীন অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব যুক্তি কোন ক্রমেই স্বার্থক হবে না। যদি শিক্ষক্ষেত্রে এই দ্বৈতনীতি পরিহার না করা হয়।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনো পর্যাপ্ত পরিমাণ পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়নি। বাংলা পরিভাষা প্রণয়ন করার বাস্তব সম্মত কোন কার্যক্রম নেই। সরকারি কাজে এখনো ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয়। ভালো ইংরেজি না জানলে সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া যায় না, ইংরেজিতে যাদের দখল বেশী তাদের চাকুরী প্রাপ্তি সহজ হয় এবং দ্রুত প্রমোশন পাওয়া যায়। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ব্যবহারের প্রবণতা এবং বাংলা ভাষার প্রতি অনীহার কারণে সর্বস্তরে বাংলা ব্যবহার এখনো সূদূর পরাহত।

আজো দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা কমেনি। অধিকাংশ লোক বাংলাভাষা বুঝেনা, অক্ষর জ্ঞান নেই। তাদের কাছে রাষ্ট্রভাষা বা সর্বস্তরে বাংলা চালুর কোন আবেদন নেই। নিরক্ষরদেরও অক্ষরজ্ঞান বা শিক্ষিত করতে না পারলে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর প্রশ্নই উঠেনা। কাজেই সবার আগে নিরক্ষরতা দূর করে বৃহত্তর গরীব জনগণকে শিক্ষিত সচেতন করে তুলতে পারলে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন ও দেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে।

ইংরেজি ভাষা চর্চার জন্য দেশে বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ ও লেখালেখির জন্য তেমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই। বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির চর্চা ও উন্নয়নে ইংরেজিই একমাত্র ভরসা আর বাংলা ভাষা আছে শুধু সাহিত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চায়। রাষ্ট্রযন্ত্র এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ রাষ্ট্রের প্রভাব সমাজ জীবনে প্রতিফলিত হয়। সরকার সক্রিয় থাকলে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হতে বাধ্য। সরকার যদি সর্বত্র বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে আমরা জাতি হিসাবে বিশ্ব দরবারে মাথা উচু করে দাড়াতে পারবনা।

'শিক্ষার মূল ধারায় ফিরে যেতে হলে আমাদের একুশের চেতনাকে লালন করতে হবে। শিক্ষার গুণগত মান প্রসারে যতটা না আর্থিক বিনিয়োগ দরকার তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন দূরদৃষ্টি, উদারতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও সমাজ সচেতনতা। এর বড় অংশই চেতনাগত সম্পদ, যার যোগান আসতে পারে পরিপুষ্ট সামাজিক উপলব্ধি থেকে এবং যেক্ষেত্রে বাঙ্গালিসমাজে বিপুল প্রেরণাসঞ্চারী হতে পারে একুশের আন্দোলন। একুশের চেতনা, আমরা দেখেছি, বহন করছে সর্বজনীনতা। ভাষার অধিকারের এই চেতনা যখন সম্প্রসারিত হয় শিক্ষার অধিকারের প্রশ্নে তখন সেই সর্বজনীনতা আরো দৃঢ়ভিত্তি অর্জন করে। শিক্ষার সুযোগ সকলের জন্য উন্মুক্ত হবে সমভাবে এবং এই প্রসারতার সঙ্গে যুক্ত থাকবে গুণগত মান। সেটা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই আমরা নিশ্চিত করতে পারব একুশের শিক্ষাচেতনার বাস্তবায়ন'। (একুশে ও আমাদের শিক্ষা চেতনা-মফিদুল হক)

জাতীর স্বার্থে, স্বাধীনতা স্বার্থে, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে সর্বপরি ভাষা আন্দোলনের চেতনা বিকাশ ও বাস্তবায়নের স্বার্থে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন করতে আজ অতি জরুরি হয়ে পড়েছে আরেকটি ভাষা আন্দোলনের। যে আন্দোলন শুধু সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করবেনা, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের গণিতে ত্বরান্বিত করবে, গড়ে তুলবে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

লেখক : ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস গবেষক, নির্বাহী পরিচালক- ভাষা আন্দোলন গবেষণাকেন্দ্র ও জাদুঘর।

তথ্যসূত্র:

১. ভাষা আন্দোলন : শিক্ষায় ভাষা পরিকল্পনা- মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।
২. ভাষা বানান শিক্ষা- শফিউল আলম, কাকলী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।
৩. ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী- রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ১৯৯৮।
৪. মিশনবার্তা, বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ১, জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৫।
৫. ভাষা আন্দোলনের পঞ্চম বছর- আহমদ রফিক ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৩।
৬. একুশে চেতনা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, ৩০ জুলাই, ২০১০।
৭. একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ- ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ সম্পাদিত, সূচীপত্র, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।

ঢাকা কমার্স কলেজ ২১শে সম্মাননা ২০১৮

ভাষা সংগ্রামে অবদানের জন্য

ড. জসীম উদ্দিন আহমেদ

ভাষাসৈনিক, একুশে পদকপ্রাপ্ত
পরমাণু বিজ্ঞানী, কবি, লেখক ও গবেষক

পরিচিতি

ড. জসীম উদ্দিন আহমেদ ১৯৩৩ সনের ১ জানুয়ারি কুমিল্লা জিলার গলিয়ার চর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম ওয়াজ উদ্দিন আহমেদ ও মাতা রাহাতুন্নেছা। ১৯৪৮ সনে গৌরীপুর সুবল-আফতাব উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিকুলেশন ১৯৫০ সনে কুমিল্লা ভিকটোরিয়া কলেজ থেকে আইএসসি, ১৯৫২ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি এবং ১৯৫৫ সনে পদার্থ বিদ্যায় এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। সকল পরীক্ষায়ই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ; এমএসসি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। ১৯৫৬ সনে ঢাকা সরকারি কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান করেন, ১৯৫৭ সনে ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনে যোগদান করেন; সাথে সাথেই আমেরিকা গমন করেন। ১৯৫৯ সনে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের রচেষ্টার ইউনিভার্সিটি থেকে আণবিক বিকিরণ নিরাপত্তা বিষয়ে এম এস, তারপর পাকিস্তানে ফেরত, করাচী পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশন লেবরেটরিতে যোগ দেন। ১৯৬১ সনে ঢাকায় বদলী হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম নিউক্লিয়ার মেডিসিন কেন্দ্র স্থাপন করার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬৩ সনের জানুয়ারী মাসে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব মিসিগানে চলে যান এবং ১৯৬৬ সনের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানে ফেরত এসে ঢাকা আনবিক শক্তি কেন্দ্রে আনবিক বিকিরণ বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগ দেন। ১৯৬৮ সনে করাচী আণবিক শক্তি কমিশন হেড অফিসে বদলী হন এবং ডাইরেক্টর পদে থাকাকালীন সময়ে ১৯৭০ সনে পাকিস্তান সরকারের স্পন্সরশিপে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সি ভিয়েনাতে যোগ দেন। দীর্ঘ ২৪ বৎসর চাকুরি করেন এবং আণবিক বিকিরণ নিরাপত্তা বিভাগের ডাইরেক্টর এবং প্রধান থাকাকালীন ১৯৯৪ সনে অবসর গ্রহণ করেন। তার পরও ২০০০ সন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন। তিনি ৪০টি দেশের আণবিক উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি আণবিক বিকিরণ নিরাপত্তা বিষয়ে ষ্ট্যান্ডার্ডস্, কোডস্, গাইডস এবং টেকনিকাল রিপোর্ট নিয়মাবলি, নীতি, উপদেশাবলি বিষয়ক ১৭টি বই প্রকাশ করেন যাহা বিশ্বের প্রায় সকল দেশে ব্যবহৃত হয়। তিনি রোটারী ক্লাবের সক্রিয় সদস্য। তিনি বেডমিন্টন খেলায় আনন্দ পান এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টেও অংশ নেন। হাটা, জগিং ও সাঁতার তার প্রিয়। তিনি ৪০ টি গ্রন্থের লেখক। তিনি একজন অন্যতম ভাষা সৈনিক। ১৯৫২ সনের ২১ শে ফেব্রুয়ারি ফ্রন্ট লাইন সংগ্রামে বাংলা ভাষার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রঙ্গণে পুলিশের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ করেন। তিনি সম্মানজনক কর্মকান্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশ বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা থেকে এ পর্যন্ত স্বর্ণপদক সহ প্রায় ২০০ টি সম্মাননা পদক পেয়েছেন। ভাষা আন্দোলনে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাহাকে একুশে পদক ২০১৬ প্রদান করে।

সম্মাননা পত্র

ড. জসীম উদ্দিন আহমেদ
ভাষা সংগ্রামে অবদানের জন্য

মহান একুশে তোমার আর্বিভাবে
ঢাকা কমার্স কলেজ পেয়েছে শ্রেষ্ঠ দান,
তোমার আগমনে খুশির ঝরনায় স্নাত দখিনা সমীর
ঘোষণা করছে কলতান।

তুমি প্রাণের ভাষা বাংলাকে রক্ষার শ্রেষ্ঠ ভাষা সৈনিক
তোমার কাপড়ে এখনো রয়েছে বরকতের রক্তের ঘ্রাণ।
তোমাকে পেয়ে আমরাও হয়েছি লড়াকু সৈনিক
সোনার হরফে লেখা থাকবে চিরদিন তোমার নাম।

সময়ের সাহসী সন্তান, তুমি কর্মজীবনেও নিবেদিত প্রাণ
তোমার যোগ্য নেতৃত্বে আণবিক শক্তি কমিশন হয়েছে বেগবান।
জীবনের সোনালি সময় তুমি এখানে করেছ দান
যতদিন রবে দেশ, ততদিন রবে তোমার মান।

তোমার কাজের তুলনা কেবলি তুমি
তাইতো একুশে পদকসহ পেয়েছ দুশোটি পুরস্কার।
সমাজ সেবায়ও রয়েছে তোমার অশেষ অবদান
তবুও তোমাকে মূল্যায়নের এগুলো কিছুই নয়
তুমিই যে সবচেয়ে দামি।

আমাদের মাঝে তুমি বেঁচে থাকবে চিরস্মরণীয় হয়ে।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮

ঢাকা কমার্স কলেজ
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

ঢাকা কমার্স কলেজ ২১শে সম্মাননা ২০১৮

ভাষা গবেষণায় অবদানের জন্য

এম আর মাহবুব

ভাষা গবেষক ও লেখক

নির্বাহী পরিচালক, ভাষা আন্দোলন গবেষণা কেন্দ্র ও জাদুঘর

পরিচিতি

এম আর মাহবুব ১৫ অক্টোবর ১৯৬৯ নরসিংদি জেলার মনোহরদি উপজেলার খিদিরপুর ইউনিয়নের চরআহম্মদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হারিছ উদ্দিন ও মাতা মোসা. রাহিমা বেগম। ব্যবস্থাপনায় স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনের শুরুটা শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে। 'নিউরন' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও ডা. আব্দুল মান্নান মহিলা কলেজে, কিশোরগঞ্জ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘদিন। বর্তমানে ভাষা-আন্দোলন গবেষণাকেন্দ্র ও জাদুঘর এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কর্মরত। তিন দশক ধরে ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসচর্চা ও শেকড়সন্ধানী গবেষণায় যুক্ত আছেন। মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিসংরক্ষণ, ইতিহাসচর্চা, গবেষণা তাঁর পেশা ও নেশা। ১৯৮৭ সনে 'ভাষা-আন্দোলন পরিষদ', ১৯৮৯ সনে 'ভাষা-আন্দোলন মিউজিয়াম', ২০০০ সনে 'ভাষা-আন্দোলন স্মৃতিরক্ষা পরিষদ', ২০০৬ সনে 'ভাষা-আন্দোলন গবেষণাকেন্দ্র ও জাদুঘর' এবং ২০১২ সনে 'একুশে চেতনা পরিষদ'- এর সাথে সাংগঠনিকভাবে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন এই মহান কর্মযজ্ঞে। ২০১০-১১ সনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন জাতীয় কমিটির সদস্য হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি 'ভাষাগৌরব' এর সম্পাদক ও 'সাগরদি'র নির্বাহী সম্পাদক। বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদের মুখপত্র 'ঊর্মি'র সম্পাদক করছেন। তিনি যেসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত আছেন তাহলো: সভাপতি- ভাষা আন্দোলন স্মৃতিরক্ষা পরিষদ, স্ববিকাশ গ্রন্থসুহৃদ সমিতি; সাধারণ সম্পাদক- শিশু নিকেতন, সাগরদি সাহিত্য পরিষদ: যুগ্ম সম্পাদক- বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ; প্রধান সমন্বয়কারী- ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র; সমন্বয়কারী- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকল্প' নরসিংদি জেলা; সদস্য- বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি, একুশে চেতনা পরিষদ; সঞ্চালক- মাসিক সাহিত্য আসর, বাশিকপ। এম আর মাহবুব এর প্রকাশিত গ্রন্থ ৫২টি। তিনি ভাষাশহিদ, ভাষাসংগ্রামীদের জীবনী ও ভাষা আন্দোলন ইতিহাস বিষয়ক ৪৫টি, মুক্তিযুদ্ধ, সাহিত্য ও বিবিধ ৭টি গ্রন্থ রচনা করেন। এম আর মাহবুব যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি লাভ করেন তাহলো: ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'আলো-আভাষ পুরস্কার', গীন ইউনিভার্সিটি ও উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'সম্মাননা স্মারক', ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গবেষণা পরিষদ কর্তৃক 'ভাষাপদক', ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ জ্ঞানপীঠ কর্তৃক 'একুশে সম্মাননা পদক', নাট্যসভা'র স্বর্ণপদকসহ আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ভূষিত হয়েছেন নানা পুরস্কার ও সম্মাননায়।

সম্মাননা পত্র

এম আর মাহবুব

ভাষা গবেষণায় অবদানের জন্য

নরসিংদির ছোট্ট শিশু আজ সারা দেশের গৌরব
গবেষণা যার ধ্যানজ্ঞান, চারিদিকে ছড়ায় সৌরভ।
তোমার মতো শিক্ষানুরাগী জ্ঞানতাপসকে পেয়ে
আজ আমরা আনন্দিত, গর্বিত ও ধন্য।

বাংলা ভাষা বাঙালি জাতির প্রাণ
সেই ভাষাকে রক্ষায় দিতে হয়েছে অনেক দাম।
সেই ইতিহাসের তুমি শ্রেষ্ঠ শিকড়সন্ধানী গবেষক
তুমি একুশের চেতনা জ্বালিয়ে রেখেছ সদা জনগণের মনে।

জ্ঞানের রাজ্যে অক্ষয় ও চিরঞ্জীব কান্ডারি তুমি
নিরলস শ্রম সাধনায় তুমি গড়েছ সোনারতরী।
বিনিময়ে আমরা পেয়েছি তোমার অমূল্য গ্রন্থগুলি
এই গ্রন্থগুলি হবে আমাদের পথচলার দিশারি।

তুমি এসেছ তাই দূর হয়েছে অন্ধকার
তুমি এসেছ তাই ভয় নেই আর।
তোমার স্পর্শে শুদ্ধ হয়েছে প্রতিটি ধূলিকণা
তোমার স্পর্শে ধন্য হয়েছি আমরা
তোমার জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যাক বহুদূর।

তোমার আগমনে আমাদের শ্রদ্ধা ব্যতীত
কিছুই দেবার নেই।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮

ঢাকা কমার্স কলেজ

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

ভাষা দিবস ২০১৮ প্রতিযোগিতার ফলাফল

২১শে'র সংগীত প্রতিযোগিতা আয়োজনে: সংগীত ক্লাব

প্রথম

ফেরদৌস জাহান আনিকা
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৭৮২১

দ্বিতীয়

নিশাত তাসনিম মৃত্তিকা
দ্বাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৫১৪৪

তৃতীয়

সাদিয়া ইসলাম ছবি
বিবিএ প্রফেশনাল
রোল: বিবিএ ৬০৫

ভাষা প্রতিযোগ আয়োজনে: রোটার‍্যাক্ট ক্লাব

প্রথম

মো. মমিন সরকার
বিবিএ সম্মান ৩য় বর্ষ
রোল: এমকেটি ১২৫৯

দ্বিতীয়

জাহিদ হাসান
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৯৭০৯

তৃতীয়

ফজলুল করিম
বিবিএ সম্মান ৩য় বর্ষ
রোল: এমকেটি ১২৩০

ভাষা বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনে: আবৃত্তি ক্লাব

প্রথম

সুমাইয়া আক্তার মুমু
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৭৮২২

দ্বিতীয়

উম্মে সুমাইয়া জয়া
দ্বাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৮২১৯

তৃতীয়

মেহরাব চৌধুরী
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৯৪৬৫

২১শে'র কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আয়োজনে: আবৃত্তি ক্লাব

প্রথম

তামান্না কায়েস ছোঁয়া
বিবিএ সম্মান ১ম বর্ষ
রোল: এমজিটি ১২৯১

দ্বিতীয়

সাদিয়া তাসনিম খান
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৭৮১৫

তৃতীয়

ফারজানা রহমান প্রভা
বিবিএ সম্মান ১ম বর্ষ
রোল: এফ ১৩১০

২১শে রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনে: সাধারণজ্ঞান ক্লাব

প্রথম

জান্নাতুল নাঈমা করবী
বিবিএ সম্মান ১ম বর্ষ
রোল: এফ ১৪০৮

দ্বিতীয়

মো. মমিন সরকার
বিবিএ সম্মান ৩য় বর্ষ
রোল: এমকেটি ১২৫৯

তৃতীয়

অন্তর সাহা
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৯৪৮১

ভাষা চিত্র প্রদর্শনী প্রতিযোগিতা আয়োজনে: আর্ট অ্যাণ্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব (ফলাফল প্রদর্শনীর পরে প্রকাশিত হবে)

শহিদ মিনার এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন জিবি চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক উপস্থিত জিবি সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ (১১/১১/২০১৩)

নব নির্মিত শহিদ মিনার (২১/০২/২০১৪)

শহিদ মিনার উদ্বোধন শেষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও আহ্বায়ক (২০১৪)

শহিদ মিনার উদ্বোধন ও দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক

কলেজ ক্যাম্পাসে শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকীসহ শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ (২১/২/১৯৯৯)

শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ (২১/২/২০১২)

শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) এবিএম আবুল কাশেম ও অন্যান্য (২১/২/২০১১)

শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল ও অন্যান্য (২১/২/২০১১)

শহিদ দিবসে পতাকা উত্তোলন করছেন
অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ (২০১৪)

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৪-এ প্রভাতফেরি

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬-এ
বক্তব্য রাখছেন বিইউবিটি প্রক্টর প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫-এ
প্রভাতফেরিতে শিক্ষার্থীরা

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ২০১৪-এ প্রধান অতিথি
ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিককে উত্তরীয় ও উপহার প্রদান করছেন অধ্যক্ষ

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি
পরিবেশন করছে আবৃত্তি ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

ভাষা শহিদ স্মরণে নাটিকা পরিবেশন করছে নাট্য পরিষদের সদস্যবৃন্দ

ঢাকা কমার্স কলেজ শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন
স্থানীয় লিটল স্কলার্স স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন অধ্যক্ষ ও জিবি শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ

শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন
কলেজ প্রশাসন ও শিক্ষক পরিষদ সচিব

সাংস্কৃতিক কমিটির পক্ষ থেকে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

একুশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ

টিচার্স কোয়ার্টার্স থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে শিক্ষক পরিবারের সন্তানেরা

একুশের প্রভাতফেরি

একুশের প্রভাতফেরি